রবীন্দ্রনাথ, প্রেসিডেন্সি কলেজে

নিত্যপ্রিয় ঘোষ*

ভারতীয় দর্শনের যোগ্য প্রবক্তা সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত যখন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক (১৯২৪-১৯৩১), রবীন্দ্র-সাহিত্য চর্চার জন্য তিনি কলেজে রবীন্দ্র-পরিষদ্ গঠনের উদ্যোগ নেন। কাব্যানুরাগী সুরেন্দ্রনাথ কবিতা লেখেন, রবীন্দ্রসাহিত্যের সমঝদার। ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত হবে তাঁর রবীন্দ্রসাহিত্যচর্চার পরিচয়, 'রবিদীপিতা'। ১৯২৭ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে স্থাপিত হলো রবীন্দ্র-পরিষদ্। এর কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথ, সহসভাপতি অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য আর সোমনাথ মৈত্র। সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত সুশীলকুমার দে ; কিন্তু উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশযাত্রা করবেন বলে সাধারণ সম্পাদক হন বিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। কলেজের অধ্যক্ষ তখন এইচ ই স্টেপলটন।

শুধুই রবীন্দ্রসাহিত্য চর্চার জন্য কোনও কলেজে একটি সমিতি হলো, এটা অনন্য ঘটনা। তৎকালীন বঙ্গদেশের এবং বলা যেতে পারে সমগ্র ভারতবর্ষের অগ্রগণ্য কলেজে এই সমিতি হলো, এটা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে শ্লাঘার বিষয়। ১৯১৩ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়ে বিশ্ব-পরিচিতি লাভ করেছিলেন বটে, বাংলা সাহিত্যে তাঁর সঙ্গে তুলনীয় সাহিত্যিক আর কেউ না থাকলেও, বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজে তখনও পর্যন্ত তাঁর স্বীকৃতি পর্যাপ্ত ছিল না। মনে করা যেতে পারে, ১৯১৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা অধ্যয়নের নতুন পর্যায় শুরু হয়েছিল, যখন এম.এ. পরীক্ষায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পঠনপাঠন স্বীকৃত হলো। পাঠ্যতালিকায় রবীন্দ্রনাথ ছিলেন না। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সীমা নির্ধারিত হয়েছিল ১৮৮০ সাল পর্যন্ত। প্রবাসী পত্রিকা সন্দেহ করেছিল, ১৮৮০ সাল কেন, যাতে রবীন্দ্রনাথকে বাদ দেওয়া যায়? এরও দুই বছর পর, প্রবাসী লক্ষ্য করেছিল, প্রবেশিকা থেকে বি.এ. পরীক্ষা পর্যন্ত বাংলা পাঠ্যপুস্তকে যে সব গ্রন্থকারের রচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, তাতে বিদ্যাসাগর (১৪), বঙ্কিমচন্দ্র (১০), চন্দ্রনাথ বসু (১০), যোগীন্দ্রনাথ বসু (১০), চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১০), রাজেন্দ্র বিদ্যাভূষণ (১০), দীনেশচন্দ্র সেন (১৩), রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (৭), রবীন্দ্রনাথ (২) ছিলেন। চন্দ্রনাথের রচনা নীতিশিক্ষার জন্য, চণ্ডীচরণ বা যোগীন্দ্রনাথের রচনা বিদ্যাসাগর বা মধুসূদনের জীবনীর জন্য, এজন্য পাঠ্যপুস্তকে এদের রচনার প্রাচুর্য বোঝা যায়, কিন্তু রাজেন্দ্র, দীনেশচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দরের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের স্বল্পতার কারণ কী, প্রবাসী প্রশ্ন করেছিল। এরও আগে, ১৯১৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় একটি বাংলা বাক্যকে মার্জিত শুদ্ধ বাংলায় লিখতে বলা হয়েছিল। যে বাক্যটিকে মার্জিত করতে বলা হয়েছিল, সেটা প্রবাসীর ধারণা রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্র' থেকে নেওয়া। রবীন্দ্রনাথও সেটা বিশ্বাস করেছিলেন, যদিও ছিন্নপত্রে সে রকম কোনও বাক্য ছিল না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গদ্যকে শুদ্ধ করতে বলা হচ্ছে, এতে বিলক্ষণ চটেছিলেন অনেকে। যা-ই হোক, যে সময়ে রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয় মহলে স্বীকৃত হচ্ছেন না বলে একটা ধারণা ছিল, পণ্ডিতেরা রবীন্দ্রনাথের ভাষাকে মার্জিত গণ্য করছেন না, সেই সময় প্রেসিডেন্সি কলেজে শুধুই রবীন্দ্রচর্চার সমিতি হচ্ছে, তাতে রবীন্দ্রনাথের খুশি হওয়ারই কথা। তিনি খুশি হয়েও ছিলেন। পরিষদের অধিবেশনগুলো কিছুদিন হওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ পরিষদের সদস্যদের কাছে একটি আশীর্বাণী পাঠিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন রবীন্দ্রকাব্য চর্চা করে সদস্যরা বিশ্বকাব্যের আস্বাদ পাবেন ভাবছেন, এতে তিনি ধন্য। রবীন্দ্র পরিষদের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে, ১৯২৮ সালে, ১৪ আশ্বিন ১৩৩৫, রবীন্দ্রনাথ সেই আশীর্বাণী পাঠান ঃ

"যেমন আকাশের এক তারা আর এক তারার সহিত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নহে, যেমন তাহাদের লইয়াই নক্ষত্র জগতের সমগ্রতা, তেমনই কাব্যলোকে প্রত্যেক স্বতন্ত্র কবিতার মধ্য দিয়া একটি অরূপ ঐক্যের গাঁথন চলিয়া বিশ্বসাহিত্যের সৃষ্টি। কোনো একজন কবিকে সত্য করিয়া জানার ভিতর দিয়া সকল কবিকেই জানার পথ প্রশস্ত হয়। আমার কাব্যকে উপলক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্র-সাহিত্য পরিষদের সদস্যগণ সাধারণভাবে কাব্য সাহিত্যে রস সম্ভোগের যে আয়োজনে প্রবৃত্ত হইবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন ইহাতে আমি নিজেকে ধন্য বোধ করিতেছি। ইহার দ্বারা যদি এই প্রমাণ হয় আমার রচনা সঙ্কীর্ণভাবে আমার স্বদেশসীমার মধ্যেই অবরুদ্ধ নহে তবে তাহা আমার পক্ষে গৌরবের বিষয় হইবে।"

প্রেসিডেন্সি কলেজের শতবার্ষিক গ্রন্থে রবীন্দ্র-পরিষদের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আছে। তাতে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে এই দিনগুলোর উল্লেখ আছে ঃ

১৩ ডিসেম্বর ১৯২৭ ঃ কলেজে কবিকে সংবর্ধনা
এপ্রিল ১৯২৮ ঃ জোড়াসাঁকোতে রবীন্দ্র-পরিষদের সভ্যরা
১৮ আগস্ট ১৯২৯ ঃ কলেজে কবি
এপ্রিল ১৯৩১ ঃ জোড়াসাঁকোতে রবীন্দ্র পরিষদের সভ্যরা
মে ১৯৩১ ঃ রবীন্দ্র-পরিষদের গ্রন্থপ্রকাশ ঃ কবি-পরিচিতি
১ মার্চ ১৯৩৩ ঃ রবীন্দ্র-পরিষদে কবি
মার্চ ১৯৩৪ ঃ রবীন্দ্র-পরিষদে কবি

প্রেসিডেন্সি কলেজের বিভিন্ন বছরের ম্যাগাজিনে রবীন্দ্র-পরিষদের অধিবেশনের প্রতিবেদনগুলো থেকে পরিষদের সাহিত্যচর্চা বিষয়ে সামান্য বিশদ আলোচনা করা সম্ভব। পরিষদে

* প্রাক্তন ছাত্র ১৯৫১-৫৫ (ইংরেজি)

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

কবির উপস্থিতির একটি দিনের উল্লেখ নেই শতবার্ষিক গ্রন্থে ঃ ১৯২৯ এর সেপ্টেম্বরে, ৪ঠা আশ্বিন ১৩৩৬।

১৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৭, ২ আশ্বিন ১৩৩৪, রবীন্দ্র সাহিত্য-পরিষদের গঠন হয়। এর উদ্বোধন হয় ২৩ সেপ্টেম্বর ফিজিক্স লেকচার থিয়েটার হলে। কলেজের সত্তরজন ছাত্র উপস্থিত ছিল। অধ্যাপকেরা অনেকে ছিলেন। বহিরাগতদের মধ্যে ছিলেন কলেজের পুরনো অধ্যাপক এবং রিপন কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এবং সুরেন্দ্রনাথের কন্যা মৈত্রেয়ী দাশগুপ্ত। এই অধিবেশনে অপূর্বকুমার চন্দ 'নটরাজ' কবিতার আবৃত্তি করেন। ছাত্ররা গান ও আবৃত্তি করে। আর সুরেন্দ্রনাথ তাঁর ধারাবাহিক প্রবন্ধ 'রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রথম স্তর'-এর সূচনা করেন।

৪ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪। পরিষদের প্রথম অধিবেশন। সোমনাথ মৈত্র ঃ বালি কবিতাপাঠ (তখনও কবিতাটি মুদ্রিত হয় নি, প্রবাসী, পৌষ ১৩৩৪ সংখ্যায় হবে।) সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ঃ রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রথম স্তর। আলোচনা।

দ্বিতীয় অধিবেশন (প্রতিবেদনে তারিখ নেই)। সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ঃ রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রথম স্তর। আলোচনা।

১৮ অগ্রহায়ণ। তৃতীয় অধিবেশন। হুমায়ুন কবীর ঃ 'মানসী'তে বাস্তব দৃষ্টি। প্রমথ চৌধুরী ঃ বাস্তবের তাৎপর্য, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের মিলন ও প্রভেদ নিয়ে আলোচনা। অধ্যাপক ভূপতিমোহন সেন বলেন, সাহিত্যের যাচাই artistic truth-এর ওজনে হওয়া উচিত।

১৩ ডিসেম্বর ১৯২৭ (প্রতিবেদনে কখনও ইংরেজি কখনও বাংলা তারিখ দেওয়া আছে)। চতুর্থ অধিবেশন। পরিষদের পক্ষ থেকে কবিকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় ফিজিক্স থিয়েটারে। উপস্থিত ছিলেন বহিরাগতদের মধ্যে সরলা দেবী, যদুনাথ সরকার, দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী। নন্দলাল বসু রৌপ্যচিহ্নিত তাম্রপত্রে পুঁথি আকারে একটি কবিতা লিপিবদ্ধ করে দেন, কবিতাটির রচয়িতা হুমায়ুন কবীর। কবির হাতে কবিতাটি তুলে দেন সুরেন্দ্রনাথ। কবিতাটি কলেজ ম্যাগাজিনে ছাপা হয়, 'রবীন্দ্রনাথ' (Vol 14, 1927-1928)। তাঁর অভিভাষণে সুরেন্দ্রনাথ বলেন, কবি তাঁর কাব্যের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা না-ও হতে পারেন, তিনি ধর্মরাজ নন, তিনি কবিরাজ। প্রত্যেকেরই নিজ স্বাতন্ত্র্যে কবির ব্যাখ্যাকে উল্লঙ্ঘন করার অধিকার আছে। উত্তরে, কাব্যের রসগ্রহণের উপায়, কাব্যালোচনায় শ্রদ্ধার প্রয়োজনীয়তা, নিকটে থাকার অন্তরালে কাব্যের রসগ্রহণে অসুবিধা, নবীন সাহিত্যের রীতি ও তাঁর কাব্যের প্রতি নবীনের প্রীতির উল্লেখ করেন কবি। রবীন্দ্র-পরিষদ তার অধিবেশনের কয়েকটি ভাষণ ভবিষ্যতে প্রকাশ করবে নিষ্ক্রান্তি হিসেবে। প্রথম বর্ষের চতুর্থ অধিবেশনে কবির ভাষণটি ছিল তার প্রথম নিষ্ক্রান্তি। কবি এই অধিবেশনে তখনও অপ্রকাশিত 'নূতন শ্রোতা' কবিতাটি আবৃত্তি করেন।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কবি তাঁর ভাষণে তাঁর কাব্যের প্রতি নবীনের প্রীতির উল্লেখ করেছিলেন। যাঁদের 'নূতন শ্রোতা' কবিতাটি মনে আছে, দেড় মাস আগে লেখা কবিতাটি পরে 'পরিশোধ' কাব্যগ্রন্থে স্থান পাবে, তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন, কবিতাটিতে নূতন শ্রোতার প্রতি অভিমানের কথাই বলেছিলেন কবি। নূতন শ্রোতা যখন শিশু ছিল তখন তার মন ছিল খেলনা গাড়িতে, বড় হলে, তার চেহারা ঃ "নতুনকালের শান দেওয়া তার ললাটখানি খরখড়্গ-সম/শীর্ণ যাহা, জীর্ণ যাহা তার প্রতি নির্মম।" নবীন শ্রোতা প্রাচীন কবির কাব্যে কেবল পায় পুরনো দিনের ইতিহাস, সেজন্য তার যেটুকু প্রশ্রয়। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্ররাই যে রবীন্দ্রনাথের উপলক্ষ্য ছিল, তা হয়তো নয়, বছর খানেক ধরেই নবীন সাহিত্যিকদের রবীন্দ্রবিদ্রোহ তিনি লক্ষ্য করছিলেন, রুষ্ট হচ্ছিলেন তারুণ্যের বাহ্বাস্ফোটে। কয়েক মাস পরেই তিনি এই তারুণ্যকে ব্যঙ্গ করে প্রবন্ধ চিঠি, আলোচনা করবেন। এই ভাষণ বিষয়ে প্রভাতকুমার তাঁর রবীন্দ্রজীবনীতে লিখেছেন, কবি বলেছিলেন, বিদেশি পাঠকেরা তাঁর কাব্যাস্বাদ পেতে চায় মেপে, কিন্তু কাব্যাস্বাদ মেপে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় ডুব দিয়ে। আর, সাহিত্যাস্বাদনে তারাই নতুন, যারা কল্পনা দিয়ে কাব্যস্বাদ পেতে চান, বয়স তাদের যাই হোক না।

১৫ জানুয়ারি ১৯২৮। পঞ্চম অধিবেশন। সুরেন্দ্রনাথ ঃ রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রথম স্তর।

১১ মার্চ ১৯২৮। ষষ্ঠ অধিবেশন। প্রমথ চৌধুরী ঃ চিত্রাঙ্গদা। এই প্রবন্ধে প্রমথনাথ 'Thompson' নামক জনৈক ইংরাজ মিশনারী'র চিত্রাঙ্গদার বিরুদ্ধে মন্তব্যের সমালোচনা করেন। সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা বলেছেন, কবি যে কোনও বস্তু নিয়ে কাব্য সৃষ্টি করতে পারেন। অতুলচন্দ্র গুপ্ত বলেন, শ্লীলতার বিচার আমরা করি সামাজিক হিসাবে, কিন্তু কাব্যের পরিমাপ আনন্দলাভে। শ্লীলতা প্রসঙ্গে অধ্যাপক বিনয়কুমার সেন জানান, কবির স্ত্রীজাতির ধারণা বিলেতে আধুনিক বলে গণ্য হয়েছে। সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত অবশ্য বলেন, রস ও ধর্মবুদ্ধির মূল এক জায়গায়। অ-সার্বজনীন বিষয়ে সামাজিক বিচার উঠবেই।

৭ বৈশাখ ১৩৩৫, এপ্রিল ১৯২৮। সপ্তম অধিবেশন, স্থান জোড়াসাঁকো। পরিষদের সভ্যদের কবি বলেন, রাজনীতির প্রভাবে আদর্শের প্রতি অনুরাগ ও culture-এর অনুশীলন চাপা পড়ে গেছে, ছেলে বয়সে আন্দোলন ও উত্তেজনার চালবাজি অশুভকর। (স্মরণ করা যেতে পারে, সিটি কলেজ হস্টেলে সরস্বতী পূজা করা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে ছাত্র আন্দোলনে অত্যন্ত বিরক্ত)। পরিষদের সদস্যদের তিনি বলেন, আর্ট সাহিত্য রাজনীতি অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা করতে হবে। শুধু অ্যাকাডেমিক বিদ্যায় মনের প্রসার হয় না। ছাত্রদের মধ্যে আগেকার মতো উদ্যম এখন আর দেখা যায় না। যেটা দেখা যায় জার্মানি আর আমেরিকার মধ্যে। এই বিষয়ে আলোচনার পর কবি একটি কবিতা পড়েন, বসন্তের একটি গান শোনান আর শোনান সদ্যোরচিত গান 'একটুকু ছোঁয়া লাগে'। পরিষদের সদস্যদের মধ্যে সুনীল সরকার, বিনয় ঘোষ আর রাধামোহন ভট্টাচার্য গান শোনান।

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

৩১ আষাঢ় ১৩৩৫। অষ্টম অধিবেশন। সুরেন্দ্রনাথ ঃ বর্ষাকাব্যের ক্রমবিকাশ। পরিষদ্ এটি নিষ্ক্রান্তি রূপে প্রকাশ করে।

২০ শ্রাবণ। নবম অধিবেশন। 'ক্ষণিকা' বিষয়ে ছাত্রদের আলোচনা।

১০ ভাদ্র। দশম অধিবেশন। অধ্যাপক জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ রক্তকরবী। এটি কলেজ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয় (Vol 15, 1928-1929)।

২৪ ভাদ্র। একাদশ অধিবেশন। কালিদাস নাগ ঃ রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ফরাসী সাহিত্য। ফরাসীতে কবির অনেক অনুবাদ হলেও, ফরাসীরা কবির মতবাদ যতটা জানে, কাব্য ততটা জানে না। কবির কবিতা আরো অনুবাদ হওয়া উচিত ফরাসীতে। এই অধিবেশনে ছাত্ররা 'কর্ণকুন্তীসংবাদ' ও 'গান্ধারীর আবেদন' অভিনয় করে।

১৪ আশ্বিন। পরিষদের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন। কবির আশীর্বাণী প্রেরণ।

৩০ আষাঢ় ১৩৩৬। প্রথম অধিবেশন। নীহাররঞ্জন রায় ঃ রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা। আলোচনা।

১৪ শ্রাবণ। দ্বিতীয় অধিবেশন। সুরেন্দ্রনাথ ঃ রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যতত্ত্ব।

১৮ আগস্ট ১৯২৯, ২ ভাদ্র ১৩৩৬। বিশেষ অধিবেশন। পরিষদে কবি 'সাহিত্যের স্বরূপ' বিষয়ে বলেন। 'মহুয়া' (যন্ত্রস্থ) থেকে কাব্যপাঠ করেন কবি।

১ সেপ্টেম্বর ১৯২৯, ১৬ ভাদ্র ১৩৩৬। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প নিয়ে আলোচনা করেন।

তৃতীয় বর্ষ। প্রথম অধিবেশন। ৪ আশ্বিন ১৩৩৬ (বিচিত্রা পত্রিকা অবলম্বনে প্রভাতকুমার বলেছেন ৫ ভাদ্র)। রবীন্দ্র-পরিষদের প্রতিবেদনে উল্লিখিত ৪ আশ্বিন ১৩৩৬ তারিখটিই ঠিক। প্রভাতকুমারের অবলম্বন বিচিত্রা ভাদ্র ১৩৩৬ আর বিচিত্রা আশ্বিন ১৩৩৬ সংখ্যার 'নানাকথা'র প্রতিবেদন। তিনদিনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ দুবার পরিষদে ভাষণ দিলে, দুটোরই প্রতিবেদন বিচিত্রার ভাদ্র সংখ্যায় হতো, ভাদ্র ও আশ্বিন দুটো সংখ্যার প্রয়োজন হতো না। পরিষদে কবির ভাষণ ঃ সাহিত্যবিচার।

রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যের স্বরূপ' আর 'সাহিত্যবিচার' ভাষণ দুটো সম্পর্কে পরিষদের প্রতিবেদনে কোন কিছুই বলা নেই। সম্ভবত, যখন প্রতিবেদন লেখা হয়, তার আগেই কবি স্বয়ং প্রবাসীর কার্তিক ১৩৩৬ সংখ্যায় দুটো ভাষণ মিলিয়ে 'সাহিত্যবিচার' প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন, যেটি 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। এই ভাষণ দুটোতে কবি বলেন সাহিত্যের স্বরূপ ব্যক্তির প্রকাশে, আর বিচার করতে হবে ব্যক্তির শ্রেণী দিয়ে নয়, তার ব্যক্তিত্ব দিয়ে। যোগাযোগের কুমুদিনীর পরিচয়ের মূলে আছে সে ব্যক্তিরূপে প্রকাশ পেল কিনা, সে নারীজাতির প্রতিনিধি হলো কিনা সেটা বিচার্য নয়। দাশরথি রায়ের পাঁচালি সাহিত্য যেহেতু সেটা দিশি, শরৎ চাটুজ্যে সাহিত্য নয় যেহেতু তাতে বিদেশির মিশেল আছে, এটা সাহিত্যের বিচার হতে পারে না। সাহিত্যের বিশ্লেষণ হতে পারে তার উপকরণ নিয়ে, ব্যাখ্যা হয় তার রসানুভূতি দিয়ে।

দ্বিতীয় অধিবেশন। ১৮ অগ্রহায়ণ। সোমনাথ মৈত্র ঃ ছিন্নপত্র। প্রবন্ধটি নিষ্ক্রান্তিরূপে প্রকাশিত।

তৃতীয় অধিবেশন। ২৯ অগ্রহায়ণ। প্যারীমোহন সেনগুপ্ত ঃ গোরা।

চতুর্থ অধিবেশন। ৬ মাঘ। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ঃ মালিনী।

পঞ্চম অধিবেশন। ২১ মাঘ। সুরেন্দ্রনাথ ঃ মহুয়া আলোচনা।

ষষ্ঠ অধিবেশন। ১১ ফাল্গুন। গিরিশ মুখোপাধ্যায় ঃ বলাকার যুগ।

সপ্তম অধিবেশন। ২৬ ফাল্গুন। বিশ্বনাথ চৌধুরী ঃ রবীন্দ্রনাথের নিসর্গ কবিতা।

বিশেষ অধিবেশন। ২৬ চৈত্র (মার্চ ১৯৩০)। কলেজের শতবার্ষিক গ্রন্থে এটা বলা হয়েছে মার্চ ১৯২৯। ফিজিক্স থিয়েটার বসন্তোৎসব। সভানেত্রী ঃ ইন্দিরা দেবী। গান গেয়ে শোনান পঙ্কজকুমার মল্লিক ও অন্যান্যরা।

নবম অধিবেশন। ৩০ ভাদ্র। নীহাররঞ্জন রায় ঃ শেষের কবিতা। সভাপতি ঃ প্রমথ চৌধুরী। অন্যদের সঙ্গে প্রিয়ংবদা দেবী ও ইন্দিরা দেবী।

চতুর্থ বর্ষ। প্রথম অধিবেশন। ৯ অগ্রহায়ণ। বিশ্বপতি চৌধুরী ঃ গীতালি, গীতিমাল্য, গীতাঞ্জলি।

দ্বিতীয় অধিবেশন। ১৮ অগ্রহায়ণ। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ঃ ক্ষণিকা।

তৃতীয় অধিবেশন। ১৫ মাঘ ১৩৩৭ (১৯৩১)। সোমনাথ মৈত্র ঃ ক্ষণিকা।

চতুর্থ অধিবেশন। ৫ ফাল্গুন। সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ঃ সাহিত্যবিচারে রবীন্দ্রনাথ।

পঞ্চম অধিবেশন। ২৮ ফাল্গুন। সুশীলচন্দ্র মিত্র ঃ খেয়া।

ষষ্ঠ অধিবেশন। ১২ চৈত্র ১৩৩৭ (এপ্রিল ১৯৩১)। জোড়াসাঁকোতে সদস্যরা।

কবি বলেন, পাশ্চাত্য সাহিত্যে সবচেয়ে বড়ো ব্যাধি সমাজকে ভাঙার চেষ্টা, মানুষকে বিদ্রূপ করা, তুচ্ছ করা। আমরাও সেটা অনুকরণ করছি। ওরা পালটাচ্ছে, কিন্তু আমরা ওদের গতিকে থামিয়ে একটা অবস্থানকে চিরন্তন মনে করছি। আমাদের বর্তমান সাহিত্য উন্মাদনাকে দেখছে, প্রাচ্য আদর্শের Reality-এর সঙ্গে Eternal-এর Harmony দেখছে না।

সপ্তম অধিবেশন। ১৯ শ্রাবণ। সুরেন্দ্রনাথ ঃ মঙ্গলবোধ।

অষ্টম অধিবেশন। ৮ ভাদ্র। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ঃ রবীন্দ্রকাব্য জিজ্ঞাসা। ২৫ বৈশাখ ঃ রবীন্দ্র-পরিষদের 'কবি-পরিচিতি' গ্রন্থ প্রকাশ।

কলেজের লাইব্রেরীতে Vol 19 (১৯৩২-৩৩) খুঁজে পাওয়া যায় নি ফলে এই সময়ের পরিষদের অধিবেশনের উল্লেখ করা গেল না। তবে শতবার্ষিক গ্রন্থ থেকে জানা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ১ মার্চ ১৯৩৩ রবীন্দ্র-পরিষদে এসেছিলেন।

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

১৮ মার্চ ১৯৩৩। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ঃ ভানুসিংহের পদাবলী।

৩১ জুলাই। সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ঃ রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প।

৩০ আগস্ট। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ঃ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত।

বক্তা 'নিশীথ রাতের বাদলধারা' গানটির বিস্তৃত সমালোচনা করে বলেন কীভাবে এই গানে বেহাগ রাগ থেকে বিচ্যুতি ঘটেছে। বক্তার মতে, 'মহারাজ একী সাজে' গানটি একটি খাঁটি বেহাগ। এই অধিবেশনে সতী দেবী গান শোনান।

পরিষদের প্রতিবেদনে ধূর্জটিপ্রসাদ কী বলেছিলেন তার বিস্তৃত বিবরণ নেই। বেহাগ থেকে বিচ্যুতি বা অবিকল বেহাগ-এতে সঙ্গীতের উৎকর্ষ/অপকর্ষ ঘটেছিল, এটা বক্তা বলেছিলেন কিনা জানা গেল না। বিশ্বভারতী সংকলিত 'সংগীতচিন্তা'য় দেখা যাচ্ছে বছর খানেক আগে, ১৩ আগস্ট ১৯৩২, রবীন্দ্রনাথ ধূর্জটিপ্রসাদের চিঠির উত্তরে লিখেছিলেন, "বাংলা গানে হিন্দুস্থানী চিঠি বিশুদ্ধভাবে মিলছে না দেখে পণ্ডিতরা যখন বলেন সঙ্গীতের অপকর্ষ ঘটছে তখন তাঁরা পণ্ডিতী স্পর্ধা করেন—সেই স্পর্ধা সব চেয়ে দারুণ। বাংলায় হিন্দুস্থানীর বিশেষ পরিণতি ঘটতে ঘটতে একটা নূতন সৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। এ সৃষ্টি প্রাণবান, গতিবান, এ সৃষ্টি শৌখিন বিলাসীর নয়—কলাবিধাতার।"

ষষ্ঠ বর্ষের শেষ অধিবেশন। ৭ ফাল্গুন ১৩৪০ (ফেব্রুয়ারি ১৯৩৪, যদিও কলেজের শতবার্ষিক গ্রন্থে বলা হয়েছে মার্চ ১৯৩৪)। পরিষদে কবি। ফিজিক্স লেকচার থিয়েটারের দরজার কাছে আল্পনা দেন রানী চন্দ। অমিতা সেন গান শোনান। কবি পলাতকা থেকে কবিতা আর 'পাত্র ও পাত্রী' গল্পটি পাঠ করেন। বহিরাগতদের মধ্যে ছিলেন প্রমথ চৌধুরী, ইন্দিরা দেবী, নির্মলকুমারী মহলানবিশ, অনিল চন্দ, রানী চন্দ, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, প্রবোধ সান্যাল।

সপ্তম বর্ষ। প্রথম অধিবেশন। ৩০ ফাল্গুন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ঃ রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প।

দ্বিতীয় অধিবেশন। ৪ শ্রাবণ (২০ জুলাই)। যতীন্দ্রমোহন বাগচী ঃ রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা সাহিত্য।

তৃতীয় অধিবেশন। ১ ভাদ্র (১৮ আগস্ট)। শৈলজানন্দ ভট্টাচার্য ঃ মিস্টিক রবীন্দ্রনাথ।

অষ্টম বর্ষ। ৩০ ফাল্গুন ১৩৪১ (১১ মার্চ ১৯৩৫)। বসন্তোৎসব। সভাপতি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর আশীর্বাণী ম্যাগাজিনে ছাপা হয়। অমিতা সেন আর ইন্দিরা দাস গান শোনান, প্রশান্তচন্দ্র আবৃত্তি করেন।

এরপর দীর্ঘকাল অধিবেশন বসে নি।

২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬। কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ঃ রবীন্দ্রনাথের কবিতায় মরণ।

২৮ মার্চ। অধ্যাপক তারাপদ মুখোপাধ্যায় ঃ শেষ সপ্তক।

৮ এপ্রিল। ডঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার ঃ বলাকা।

১৭ ভাদ্র ১৩৪৩ (সেপ্টেম্বর ১৯৩৬) ঃ বিমলচন্দ্র সিংহ ঃ গদ্যকাব্য ও রবীন্দ্রনাথ।

১৭ আশ্বিন। মুকুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঃ মুক্তির আকাঙ্ক্ষা।

১০ ডিসেম্বর ১৯৩৬। অধ্যাপক শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য ঃ রবীন্দ্র-সাহিত্যে পল্লীপ্রকৃতি।

২ মার্চ ১৯৩৭। অধ্যাপক শশাঙ্কশেখর বাগচী ঃ রবীন্দ্রকাব্যে প্রথম যুগ।

এর পরের অধিবেশন কয়েকটার খবর পাওয়া যায় নি, কলেজ লাইব্রেরিতে Vol 26 না থাকাতে। পরবর্তী অধিবেশনের খবর এইরকম ঃ

৭ সেপ্টেম্বর ১৯৪০। সুধাময় ভট্টাচার্য ঃ রবীন্দ্রসাহিত্যে সমাজপ্রগতির রূপ।

২৪ এপ্রিল ১৯৪১। প্রমথনাথ বিশী ঃ রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র।

৯ সেপ্টেম্বর ১৯৪১। অতুলচন্দ্র গুপ্ত ঃ রবীন্দ্রনাথ।

প্রেসিডেন্সি কলেজের বিভিন্ন সময়ের ম্যাগাজিন থেকে জানা যাচ্ছে, এই দিনগুলোতে রবীন্দ্রনাথ কলেজে এসেছিলেন ঃ

রবীন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথম আসেন ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯১৭ তারিখে। সেখানে বঙ্গ সাহিত্য সভায় তিনি বক্তৃতা দেন। বক্তৃতাটির সারাংশ কলেজ ম্যাগাজিনে ছাপা হয় Vol 4 No 2 পৃষ্ঠা ১২৩-১২৫। (পরিশিষ্ট ১)

দ্বিতীয়বার আসেন ২১ আগস্ট ১৯২২। কলেজে তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। Welcome Rabindranath প্রতিবেদনে এই সভার বিবরণ দেওয়া হয়। (পরিশিষ্ট ২) বক্তৃতাটি, প্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্তের অনুলিখনে, কলেজ ম্যাগাজিনে ছাপা হয়, Vol 9 No 1 1922 September-এ, পৃষ্ঠা ৯৭-১০৪। বিশ্বভারতীর রবীন্দ্ররচনাবলীর ২৭ খণ্ডে যখন এই বক্তৃতা বিশ্বভারতী সংকলনে ৬ সংখ্যক বক্তৃতারূপে মুদ্রিত হল, তখন অনুলিখনের প্রদ্যোতকুমার উল্লেখিত হন নি, ইংরেজি তারিখও ভুল দেওয়া হয় সেপ্টেম্বর ১৯২২।

তৃতীয়বার আসেন ৪ঠা জানুয়ারি ১৯২৪। বন্ধু মনোমোহন ঘোষের তিরোধানে কবি বক্তৃতা দেন। সেটি ছাপা হয় কলেজ ম্যাগাজিন Vol 10 No 3 পৃষ্ঠা ৩০৫-৩০৮, 1924 March-এ। (পরিশিষ্ট ৩)

১৯২৪ সালেই চীনে যাওয়ার পথে কবি কলেজে আসেন ১০ সেপ্টেম্বর ১৯২৪। এ বিষয়ে প্রতিবেদন আছে Vol 11 No 1, 1925 March-এ।

পঞ্চমবার। নবগঠিত রবীন্দ্র-পরিষদে কবি সংবর্ধনা। ১৩ ডিসেম্বর ১৯২৭। এর প্রতিবেদন আছে ম্যাগাজিনের Vol 14, 1928 March-এ।

ষষ্ঠবার। রবীন্দ্র-পরিষদে কবি। ১৮ আগস্ট ১৯২৯। প্রবন্ধ পাঠ ঃ সাহিত্যের স্বরূপ। ম্যাগাজিনে প্রতিবেদন Vol 15, 1929 September-এ।

সপ্তমবার। রবীন্দ্র-পরিষদে কবি। ৪ আশ্বিন ১৩৩৬, সেপ্টেম্বর ১৯২৯। প্রতিবেদন ম্যাগাজিনের Vol 16 1930 March-এ। কবির প্রবন্ধপাঠ ঃ সাহিত্য বিচার।

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

অষ্টমবার। রবীন্দ্র-পরিষদে কবি। ১ মার্চ ১৯৩৩। কলেজ লাইব্রেরিতে Vol 19 না থাকায় প্রতিবেদনটি জানা যাচ্ছে না।

নবমবার। রবীন্দ্র-পরিষদে কবি। মার্চ ১৯৩৪। ৭ ফাল্গুন ১৩৪০। ম্যাগাজিনের Vol 20 1934 September-এ প্রতিবেদন।

প্রেসিডেন্সি কলেজ ম্যাগাজিনের Vol 24-এ, ১৯৩৭-এর সেপ্টেম্বর সংখ্যায় কলেজের প্রিন্সিপাল ভূপতিমোহন সেন ভূমিকায় লেখেন, We are fortunate in being able to print in this issue a short poem from Tagore whom we are proud to claim as one of our ex-students even though he was in the college for one day only. রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে ১ ভাদ্র ১৩৪৪ তারিখসহ কবিতাটি মুদ্রিত ছিল সেই সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায়। ম্যাগাজিনের পরবর্তী একটি সংখ্যায়ও কবিতাটি পুনর্মুদ্রিত হয়। কবিতাটি এই,

অস্ত রবির আলো শতদল
মুদিল অন্ধকারে
ফুটিয়া উঠুক নবীন ভাষায়
শ্রুতিবিহীন নবীন আশায়
নব উদয়ের পারে। (পরিশিষ্ট ৪)

প্রেসিডেন্সি কলেজের সৌভাগ্য হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের আর একটি কবিতা প্রথম ছাপার। Vol 25/2 সংখ্যায়, ১৯৩৯-এর মার্চের, ৪৯ সংখ্যক পৃষ্ঠায় কবির হস্তাক্ষরে মুদ্রিত হয় ছন্দ কবিতাটি। কবিতাটিতে তারিখ দেওয়া আছে ১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৪৫। ছন্দ কবিতা (গগনে গগনে ধায় হাঁকি) বর্ত্তমানে 'তাসের দেশ' নাটকে অন্তর্ভুক্ত। 'তাসের দেশ' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৪০-এ (১৯৩৩), পরিবর্ধিত রূপে ১৩৪৫-এর মাঘ-এ। পরিবর্ধিত রূপে যে সব নতুন গান যোগ করে হয়েছিল, ছন্দ তাদের অন্যতম। 'তাসের দেশ'-এর পরিবর্ধিত সংস্করণ করার আগে গান বা কবিতাটি প্রেসিডেন্সি কলেজের ম্যাগাজিনে ছাপা হয়। ম্যাগাজিনে অবশ্য এবিষয়ে কোনও মন্তব্য বা তথ্য দেওয়া নেই।

প্রেসিডেন্সি কলেজের শতবার্ষিক গ্রন্থে ১ জানুয়ারি ১৮৭৫-কে বলা হয়েছে কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের প্রথম পুনর্মিলন উৎসব। এই সভায় রাজনারায়ণ বসু যে ভাষণ দেন সেটাই প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাস বলে গণ্য হয়। তথ্যটি ঠিক নয়। ওই দিন মরকত-কুঞ্জ, Emerald Bower-এ কলেজ রি-ইউনিয়ন উৎসব হয় ঠিকই, তবে সেটা শুধুই প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের নয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের। এই পুনর্মিলন উৎসবে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি নিয়ে বিভিন্ন রবীন্দ্রজীবনীতে অস্পষ্টতা আছে। রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'আত্মচরিত'-এ লিখেছেন, তিনি সতীর্থ হিন্দু কলেজের সহপাঠী জগদীশনাথ রায়কে প্রস্তাব দেন, হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের পুনর্মিলনের। কিন্তু জগদীশনাথ সেটাকে প্রসারিত করে সব কলেজের প্রাক্তনদের পুনর্মিলনের প্রস্তাব করেন। উৎসবটি সব কলেজের প্রাক্তনদের নিয়েই হয়। সেই উৎসবে রাজনারায়ণের সহপাঠী এবং রামগোপাল ঘোষের ভাগিনেয় নবীনচন্দ্র পালিত বাংলা পুস্তক থেকে পড়বার সময় একটি অশ্লীল স্থান পড়তে গেলে জগদীশনাথ তাঁকে তিরস্কার করে থামিয়ে দেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'আধুনিক সাহিত্য' এবং 'জীবনস্মৃতি'তে এই পুনর্মিলন উৎসবের উল্লেখ করেছেন। তিনি সেই উৎসবে ছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, কোন্ উৎসবে? ১৮৭৫-এর ১ জানুয়ারি মরকতকুঞ্জে প্রাক্তন কলেজ ছাত্রদের প্রথম পুনর্মিলন হয়, ১৮৭৬-এর ৩১ জানুয়ারি দ্বিতীয় পুনর্মিলন। রবীন্দ্রনাথ কি প্রথমটিতে ছিলেন, দ্বিতীয়টিতে, না, দুটো উৎসবেই? এবং কেনই-বা থাকবেন। ১৮৭৫-এ তিনি সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ফিফ্‌থ্ ইয়ার বা প্রিপ্যারেটরির ছাত্র, ১৮৭৬-এও তাই, কেননা ক্লাস করতেন না, প্রোমোশনও পান নি। প্রাক্তন কলেজ ছাত্র হিসাবে তাঁর থাকার কথা নয়। তবে, প্রাক্তনদের উৎসবে বহিরাগত কেউ আসতে পারবেন না, এমন কোনও নিয়ম নেই। দাদারা সবাই (সত্যেন্দ্রনাথ, বীরেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ) হিন্দু কলেজের ছাত্র, উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে আত্মীয় যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মরকত-কুঞ্জে, সুতরাং দর্শক হিসাবে রবীন্দ্রনাথ থাকতেই পারেন। আধুনিক সাহিত্যের বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধে এবং জীবনস্মৃতিতে বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গে, রবীন্দ্রনাথ জানান, এই পুনর্মিলন উৎসবেই তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখেন এবং একটি অশ্লীল শ্লোক শুনে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্কোচ লক্ষ্য করেন। প্রথম পুনর্মিলন উৎসবে এই অশ্লীলতার প্রসঙ্গ এনেছিলেন রাজনারায়ণ। দ্বিতীয় পুনর্মিলন উৎসবে আবার অশ্লীল কবিতার আবৃত্তি ঘটবে, এটা অস্বাভাবিক এবং সমসাময়িক কোনও প্রতিবেদনে তার উল্লেখও নেই। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ এই প্রথম পুনর্মিলনেই বঙ্কিমচন্দ্র-দর্শন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্কোচ প্রসঙ্গ তুলেছেন। কিন্তু বিভ্রান্তি ঘটে, রবীন্দ্রনাথ বলছেন তিনি শুনেছিলেন সংস্কৃত শ্লোক, পড়েছিলেন কোনও পণ্ডিত মহাশয়। সেটা ছিল স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক, দেশানুরাগের, এবং তৎসহ বাংলা ব্যাখ্যা। রসটা রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল বীভৎস। রবীন্দ্রনাথ এটা বলেছেন বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধে। জীবনস্মৃতিতে তিনি বলেছেন, ব্যাখ্যাটি অশ্লীল না হলেও ইতর ছিল। আর রাজনারায়ণ বসু বলেছেন বাংলা পাঠ এবং অশ্লীলতার। এই ক্ষেত্রে আমরা রাজনারায়ণকেই ঠিক মনে করি, কেননা তিনি উদ্যোক্তা এবং ব্যাখ্যাকারের নামও বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ তখন চৌদ্দ বছরের বালকমাত্র।

দ্বিতীয় পুনর্মিলনে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি সম্পর্কে কোনও দ্বিমত নেই। জীবনস্মৃতিতে যদিও তিনি এটাকে বলেছেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন ছাত্ররা, তিনি কলেজ ছাত্রদের কথাই বলছেন, কেননা ১৮৭৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ-এম.এস.সি পঠনপাঠন শুরু হয় নি। সমসাময়িক পত্রিকা The Bengalee জানিয়েছে রবীন্দ্রনাথ এই উৎসবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সরোজিনী নাটক থেকে কবিতা পাঠ করেছিলেন। এই পুনর্মিলনের সাধারণ-সম্পাদক ছিলেন চন্দ্রনাথ বসু, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় প্রধান উদ্যোক্তা। যদিও রবীন্দ্রনাথ প্রাক্তন কলেজ ছাত্র নন, কিন্তু

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

'কোনো এক দূর ভবিষ্যতে আমিও তাঁহাদের এই সম্মিলনীতে অধিকার লাভ করিতে পারিব' (জীবনস্মৃতি), তাই চন্দ্রনাথ তাঁকে কবিতা পড়ার ভার দিয়েছিলেন।

শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সির ছাত্র হয়েওছিলেন, বহিরঙ্গ ছাত্র, হিসেবে। কিন্তু সতীর্থদের বিরূপ আচরণে দ্বিতীয় দিন যান নি, ১৯৩৭-এর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তথ্যটি জানিয়েছেন। কিন্তু সেটা কবে? ১৮৭৬-এ তিনি সেন্ট জেভিয়ার্সে প্রাক্-এন্ট্রান্সের ছাত্র, নামেই যদিও। এই সময়ে তাঁর কলেজে ভর্তি হওয়ার যোগ্যতা নেই। এই সময়ে তিনি বাড়িতেই পড়াশুনা করছেন, তারপর শিলাইদহ-কলকাতা-আমেদাবাদ-লণ্ডন হয়ে ফিরে এলেন ১৮৮০-এর ফেব্রুয়ারিতে। এবার তিনি লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজের প্রাক্তন ছাত্র, যদিও কোনও ডিগ্রি না দিয়েই ফিরেছেন। কলকাতায় ফিরে এবার তিনি বহিরঙ্গ ছাত্র হতেই পারেন।

পরিশিষ্ট ১

রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণ ॥*

আমার এই মনে হয়, ইংরাজী ভাষার মধ্য দিয়ে সমগ্র জগৎ জ্ঞানের ও ভাবের সম্পদ গ্রহণ করেছে, সেটা সত্য কথা। বর্ত্তমান কালের ধর্ম্মের বিরুদ্ধে গেলে মানুষকে ঠক্‌তে হবে। যারা বর্ত্তমান কালের মধ্য দিয়ে যায়নি, সে সমস্ত দেশ জীবন-সংগ্রামে পিছিয়ে পড়্‌বে। ইয়োরোপীয় সভ্যতাকে যারা সত্য বলে গ্রহণ করেছে, তারাই উন্নতি করচে। বর্ত্তমান যুগ ইয়োরোপীয় সভ্যতার যুগ। এখন এমন কোনো জিনিষ চল্‌বে না, যা ইয়োরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে ছন্দ রক্ষা না করে চলবে। বিশ্বপৃথিবীর সহিত আমাদের ব্যবহারের মূলে ইয়োরোপীয় সভ্যতা। ইংরাজীর ভিতর দিয়ে ইয়োরোপীয় শিক্ষালাভ করার সুযোগ পেয়েছি, সেটাকে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করবো। আজকে সেটাকে যদি ব্যবহারে না লাগাতে পারি ত' আমরা ঠক্‌বো। কিন্তু বাঙ্গালাভাষা যদি আয়ত্ত না হয় তা হলে যা আমরা শিখব তা প্রয়োগ করতে পারব না। যাঁরা ইংরাজী শিক্ষা কর্‌বেন, তাঁদের আপনার ভাষায় প্রকাশ করবার জ্ঞান যদি না জন্মায়, তা হ'লে সেই শিক্ষালব্ধ জ্ঞান মরুভূমিতে বৃষ্টি পতনের মত হ'বে। যেখানে আমরা ইংরাজীর ভিতর দিয়ে ইয়োরোপীয় সভ্যতাকে গ্রহণ কর্‌ছি, সেটা যাতে সর্ব্বত্র প্রচার করতে পারা যায়, তার ব্যবস্থা করা উচিত। আমাদের হৃৎপিণ্ডের একটা কাজ হ'চ্ছে—একবার রক্ত সেখান থেকে আসে, সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত হয়, আবার হৃৎপিণ্ডে ফিরে যায়, সেইরূপ বিশ্ববিদ্যালয়কে জ্ঞানদেহের হৃৎপিণ্ড মনে কর্‌লে, দেখা যায় তার দুইটি ক্রিয়া আছে—তার একদিক দিয়ে জ্ঞান এসে জম্‌বে, তারপর চারিদিকে সেটা পরিব্যাপ্ত হবে। দুইটিই চাই, কোনটিকে অবজ্ঞা করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযোগিতা আর থাকবে না। একথা অত্যন্ত সহজ কথা। এ সকল কথা বল্‌তে গিয়ে যে যুক্তি দিতে হবে এ আমি মনে করি না। তবে যখন দেশে অস্বাভাবিকতার উদয় হয়, যখন সহজ কথা বিশেষ করে বুঝাতে হয়। ইংরাজী ভাষার চর্চ্চায় পাছে লেশমাত্র ব্যাঘাত হয়, এইটে মনে রেখে আমাদের অভিভাবকদের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষার আলোচনা সম্বন্ধে যে কুণ্ঠা দেখা যায়, সেটা ইংরাজের মনে ত' দেখি না। একটা কারণ, ইংরাজী ভাষায় আমাদের জীবিকা নির্ব্বাহের প্রয়োজন আছে। যেখানে ইংরাজী শিখ্‌লে রাজকর্ম্মচারীর পদপ্রাপ্ত হওয়া যায়, সেখানে একটা আশঙ্কা হয়, যদি এর কোনও শৈথিল্য হয় ত' আমাদের পক্ষে সেটা সাংঘাতিক হবে।

এ সম্বন্ধে জাপানের সঙ্গে আমাদের তুলনা করা যেতে পারে। ইয়োরোপীয় শিক্ষা যেমন জাপান আপামর সাধারণের মধ্যে বিতরণের উপায় অবলম্বন করেছে, তাতে করে সে পৃথিবীর মধ্যে খুব বড় একটা স্থান অধিকার করেছে। আমি সেখানে গিয়ে দেখলুম, ছোট ছোট অল্পবয়স্কা দাসী জাপানী ভাষায় এমন এমন সব বই পড়ছে যে আমাদের শিক্ষিত লোকেও সে সব পড়ে না। আমার বাড়ীর বালিকা দাসী যখন বল্লে যে তার 'সাধনা' পড়্‌তে ভাল লাগে, তখন বিস্মিত হয়েছিলুম। তারপর যখন সে দেখালে যে 'সাধনার' জাপানী অনুবাদ তার হাতে আছে, তখন আরও বিস্মিত হলুম। সেখানকার সাধারণ ব্যক্তি—সমাজে যাদের বড় স্থান নয়—তারা সকলেই উৎসাহের সঙ্গে জ্ঞানালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছে—নূতন যুগের নূতন বার্ত্তা তাদের মনকে অভিষিক্ত করেছে। এর প্রধান কারণ মাতৃভাষার মধ্যে দিয়ে তারা বিশ্বের জ্ঞানের রস পেয়েছে। এই নূতন যুগের সমস্ত জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য ভাব—সমস্ত তাদের দ্বারে এসে পড়েছে—সমস্ত জ্ঞানের ভাবের সম্পদ্ জাপানের চিত্তের মধ্যে গিয়ে উপনীত হয়েছে। এইটে যখন চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পার্‌চি, তখন বুঝতে পারি যে আমাদের ভবিষ্যতের সমস্ত উন্নতি নির্ভর কর্‌চে, আমাদের এই নিজের ভাষাকে গৌরবান্বিত করে তোলার উপরে। আমাদের দেশ কেবল ভৌগোলিক ভূখণ্ড মাত্র নয়, কেবল মাটী দিয়ে তৈরী সীমার দ্বারা আবদ্ধ নয় ; এই যদি হ'ত তবেত চাষবাস ক'রে দিন কেটে' যেত আর মনে হ'ত দেশের সম্বন্ধে সব কর্ত্তব্য শেষ করলুম। কিন্তু আমাদের একটা মানসভূমি আছে—আমাদের মন জন্মগ্রহণ করেচে আমাদের দেশের সাহিত্যের ক্ষেত্রে। প্রাকৃতিক শক্তিপুঞ্জকে—খনিজ পদার্থ প্রভৃতিকে যেমন আমরা ব্যবহারে আন্‌তে পারলে উন্নতি লাভ করি, সেইরূপ আমাদের এই মানস জন্মভূমির এই সাহিত্য ক্ষেত্রের সমস্ত শক্তির পূর্ণতা সাধনেই আমাদের উন্নতি। বাঙ্গালা দেশ কি কেবল ইয়োরোপের পাটের বস্তাই যোগাবে? বিদেশের সঙ্গে আমাদের এই বাণিজ্য সম্বন্ধ আমাদের দারিদ্র্য দুর করেছে—সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের যোগ ক'রে দিয়েছে তার সন্দেহ নেই, কিন্তু সেটুকু কত সামান্য। নীল, পাট, ধান, গরুর চামড়া কি হাড় দেশাদেশান্তরে যাবে বলে সেইটুকুই সব হ'ল—তাত নয়। আমাদের মানসভূমির কি চাষ বন্ধ থাকবে? সেখানকার উৎপন্ন দ্রব্য কি পৃথিবীকে দিতে হবে

* প্রেসিডেন্সি কলেজ বঙ্গীয় সাহিত্য সভার বাৎসরিক অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ।

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

না? জ্ঞানের পণ্য, ভাবের পণ্য সম্বন্ধে আমাদের কেবল আমদানিই চল্‌বে আর রফ্‌তানি একেবারে বন্ধ?

সাধারণতঃ শুন্‌তে পাওয়া যায়—অনেকে বলেন যে তোমাদের সাহিত্যে আছে কি? কিন্তু সেটা বল্‌তে লজ্জা পাওয়া উচিত। সে লজ্জা ভাষার নয়। আমাদের ভাষার এমন শক্তি আছে যে তাতে আধুনিককালের ও প্রাচীনকালের সমস্ত ভাব বাঙ্গালা ভাষার ভিতর দিয়ে প্রকাশ কর্‌তে পারি। যদি শিক্ষার সঙ্গে ভাষার যোগ না কর্‌তে পারি, ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বাড়্‌বে না। শিক্ষার সঙ্গে সজীব ভাষার প্রত্যক্ষ যোগ। আমাদের মন যতটা পায়, সেটাকে আমাদের ভাষার মধ্যে প্রকাশ কর্‌তে হবে। ভাষা ও শিক্ষার সংযোগ না থাক্‌লে দুর্গ্রহ হবে। জৈব উপকরণ হ'লে মানুষ যেমন সেটাকে আপনার দেহের সামিল করে' নিতে পারে, লালার সঙ্গে মিশিয়ে জারক রসের মধ্য দিয়ে আপনার শারীর পদার্থ করে নিয়ে আপনার স্বাস্থ্য বৃদ্ধি করে, ইংরাজী শিক্ষাকে আমরা তেমন ক'রে আপনার জিনিষ কর্‌তে পারিনি। যতক্ষণ পর্য্যন্ত শিক্ষাকে ভাষার মধ্য দিয়ে জৈব পদার্থ না কর্‌তে পারি, ততক্ষণ সে শিক্ষা আমাদের পরিহাস করবে। এই পরিহাস দিন দিন বেড়ে উঠ্‌ছে।

আমাদের বাঙ্গালা ভাষা ত আর দাঁড়িয়ে নেই, যদিও বা এর সভা জগতে স্থান নেই, যদিও ভারতীয় রাজসভায় এর স্থান সম্ভবপর নহে, তবুও যখন থেকে আমাদের চিত্তের উন্মেষ হয়েচে, অন্তরের ভিতর তখনই তার জাগরণ প্রথম বিহঙ্গের অস্ফুট কাকলীর ন্যায় এই ভাষার ভিতর দিয়ে প্রকাশ পেয়েচে, সুতরাং আজকের দিনে এই ভাষাকে কেউ ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পারবে না। আমার কথা এই যে আপনারা এতগুলি যুবক আছেন, আপনাদের মধ্যে প্রবল শক্তি রয়েছে। আপনাদের কাছে কত বড় দাবী ; আপনাদের সকলের কাছে উপস্থিত—দেশের ভাষার দাবী, মানসজন্মভূমির দাবী। এটা ছোট জিনিষ নয়, যা অসম্পূর্ণ আছে, সেটাকে আমাদের চেষ্টায় সম্পূর্ণ কর্‌তে হবে। এইখানে একটা গৌরবের কথা আছে, বাহির থেকে যে রুটীন ঠিক্ করা হয়, সেটা আমরা মানতে বাধ্য, কিন্তু যেটা আমরা আন্তরিক প্রীতির সহিত করব, সেটার গৌরব খুব বেশী। এই যে আয়োজন হয়েছে, এই যে ক্ষুদ্র সভাটি অত্যন্ত ক্ষমতার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়েচে—ইহা সকলকে ছাড়িয়ে যাবে আমি এই আনন্দটুকু জানাবার জন্য আপনাদের কাছে ছুটে এসেছি।

১লা আশ্বিন, ১৩২৪।

পরিশিষ্ট ২

Welcome, Rabindranath !

Rabindranath In The Presidency College

(From Our Special Correspondent)

The Poet-Laureate of Asia in our midst ! The news had been ringing throughout the entire College for sometime past that the great Prophet of Peace, Dr. Rabindranath Tagore, was to be in our midst : and thanks to the untiring zeal and effort of Mr. Suresh Chandra Ray, our able Secretary to the College Union, the fondest hopes were realized on the 21st August, 1922.

Dr. Rabindranath was advertised to arrive at 4 P.M., but long before the appointed time, the Physics Theatre was literally packed from top to bottom. Volunteers with their red-and-blue badges could but ill regulate the tremendous gathering. There was a large proportion of Professors present, but for once the Students seemed to have broken loose from the rigid grip of College discipline in their unbounded enthusiasm to welcome one who lies dearest to their very hearts.

At about five minutes to four, the Poet entered the room amidst deafening cheers, led by Professor S. C. Mahalanobis, I.E.S., the President of the Meeting, Prof. Khagendranath Mitter, and Mr. Suresh Chandra Ray, the Secretary. The great Poet looked every inch a Sage, a Maha-Rishi of the dreamy past,—a Prophet, with his flowing golden hair and his flowing garments made of the simplest *Grand* Silk. The representative of India's culture, the Spirit of India's life, Dr. Tagore stood before us the very embodiment of India's Soul, calm yet dignified.

The President, Professor Mahalanobis, first read out a Message from our Principal who should have presided, but could not on account of unavoidable causes. He, then, on behalf of the College, offered a feeling welcome to the honoured guest of the evening and said :

"Revered Sir, you command our heart-felt esteem, we make obeisance to you. You are the Ideal for us, therefore we follow you. You are the very dearest to us, therefoe we love you. Our welcome goes to you from our very hearts."

The Poet modestly acknowledged our Greetings and then delivered his charming address on the Visva-Varati. It took about one and a half hour.

পরিশিষ্ট ৩

পরলোকগত

অধ্যাপক মনোমোহন স্মৃতি-সভায়

সভাপতি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের অভিভাষণ।

আমি দুর্ব্বলতা ও ক্লান্তিতে আক্রান্ত। একদিকে জরা ও অপরদিকে যৌবন-সুলভ কর্ম্ম এ দুইয়ে মিলে আমাকে ক্লান্ত করে ফেলেছে। এ সভার উদ্যোক্তারা যখন আমাকে সভাপতি করবার প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন তখন আমি তাতে দ্বিধা বোধ করেছিলাম। কিন্তু কয়েকটি বিশেষ কারণে আজ আমি এখানে এসেছি। প্রথমতঃ, কবি মনোমোহন ঘোষের মাতামহকে

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

আমি আমার পরম আত্মীয় বলে জানতুম। শৈশব কালে তাঁর কাছে থেকেই প্রথম আমি ইংরাজী সাহিত্যের ব্যাখ্যান শুনেছিলাম। ইংরেজ কবিদের মধ্যে কে কোন্ শ্রেণীতে আসন পান, তাহা তিনিই আমাকে প্রথম বুঝিয়েছিলেন। যদিও আমাদের বয়সের যথেষ্ট অনৈক্য ছিল তথাপি তারপর অনেকদিন পর্য্যন্ত দুজনের মধ্যে একটা সম্বন্ধ ছিল। এক এক সময়ে তাঁর আশ্চর্য্য যৌবনের তেজ দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি।

মনোমোহন, অরবিন্দ ও ভাইদের সকলকে নিয়ে তাঁদের মা যখন ইংলণ্ডে পৌঁছলেন, তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলুম। শিশুবয়সেই তাঁদের আমি দেখেছি। ইংলণ্ডে দুঃসহ দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃতিত্ব লাভ করেছেন। সে কথা আপনারা সবাই জানেন। মনোমোহন যখন দেশে ফিরে এলেন তখন তাঁর সঙ্গে আমার পুনরায় পরিচয় হয়—সে পরিচয় আমার কাব্যসূত্রে। সেইদিন সেইক্ষণ আজ আমার মনে পড়ে। জোড়াসাঁকোয় আমাদের বাড়ীর দক্ষিণের বারান্দায় "সোণার তরী" পড়ছিলুম। মনোমোহন তখন সেই কাব্যের ছন্দ ও ভাব নিয়ে অতি সুন্দর আলোচনা করেছিলেন। বাংলা ভাষার সঙ্গে তাঁর পরিচয় না থাকা সত্ত্বেও শুধু বোধশক্তি দ্বারা, তিনি কাব্যের অন্তর্নিহিত ভাবটুকু গ্রহণ করিতে পেরেছিলেন। আজকে তাঁর স্মৃতি-সভায় আমরা যারা সমবেত হয়েছি, তাদের মধ্যে অধিকাংশই তাঁর যথার্থ স্বরূপ যেখানে—তাঁর মধ্যে যা চিরকাল স্মরণযোগ্য—সে জায়গায় তাঁকে হয়ত দেখেননি। এ সভায় তাঁর অনেক ছাত্র উপস্থিত আছেন। তিনি সুদীর্ঘকাল ঢাকা কলেজে, কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করেছেন। ছাত্র হিসাবে যে কেহ তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তাঁর মধ্যেই তিনি সাহিত্যের রস সঞ্চার করেছিলেন। অধ্যাপনাকে অনেকে শব্দতত্ত্বের আলোচনা বলে ভ্রম করেন—তাঁরা অধ্যাপনার প্রকৃত অধিকারী নন। মনোমোহন ঘোষ তাঁর অসাধারণ কবিত্ব ও কল্পনাশক্তির প্রভাবে সাহিত্যের নিগূঢ় মর্ম্ম ও রসের ভাণ্ডারে ছাত্রদের চিত্তকে আমন্ত্রণ করেছিলেন। যে শিক্ষা এক চিত্ত হ'তে আরেক চিত্তে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয়, ছাত্রদের চিত্তে আনন্দ সঞ্চার করে, তাহাই যথার্থ শিক্ষা। সাধারণ শিক্ষার চেয়ে এ ঢের বড় জিনিস। যে শক্তি নিয়ে তিনি আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন তাতে নিঃসন্দেহ তাঁর গভীর ক্ষতি হয়েছিল। আমি যখন ঢাকায় কনফারেন্সে গিয়েছিলুম তখন তাঁর নিজের মুখে একথা শুনেছি। অধ্যাপনা যদি সত্য সত্যই এমন হত যে ছাত্রদের চিত্তের সঙ্গে অধ্যাপকের চিত্তের যথার্থ আনন্দ বিনিময় হতে পারে তবে, অধ্যাপনায় ক্লান্তি বোধ হ'ত না। কিন্তু আমাদের দেশে যথার্থ ভাবে অধ্যাপনার সুযোগ কেউ পান না। অধ্যাপক সাহিত্যের যথার্থ মর্ম্ম উদঘাটন ও ছাত্রদের চিত্তবৃত্তির উদ্বোধন করতে চেষ্টা করেন, তেমন অধ্যাপক উৎসাহ পান না। ছাত্রেরাই তাঁর অধ্যাপনার প্রণালীর বিরুদ্ধে নালিশ করে। তারা বলে, "আমরা পাস করবার জন্যে এসেছি। নীল পেন্সিল দিয়ে দাগ দিয়ে আমাদের এমনতর ধারা দেখিয়ে দিতে হবে যাতে আমরা পাস করবার গহ্বরে গিয়ে পড়তে পারি।" এই জন্যই অধ্যাপনা করতে গিয়ে ভাল অধ্যাপকেরা ব্যথিত হন। ফলে নিষ্ঠুর শিক্ষা দিতে গিয়ে তাদের মন কলের মত হয়ে যায়, তাদের রসও শুকিয়ে যায়। আমাদের দেশে পড়ানটা বড় নীরস। এজন্য মনোমোহন বড় পীড়া অনুভব করতেন। এই অধ্যাপনার কাজে তাঁকে অত্যন্ত ক্ষতিস্বীকার ক'রতে হয়েছিল।

অনেক স্থলে ত্যাগস্বীকারের একটা মহিমা আছে। বড়র জন্যে ছোটকে ত্যাগ করা, ভাবের জন্য অর্থ ত্যাগ করা, ও আত্মার জন্য দেহকে ত্যাগ করার মধ্যে একটা গৌরব আছে। কিন্তু যেখানে যার জন্যে আমরা মূল্য দিই তার চেয়ে মূল্যটা অনেক বেশী, সেখানে ত্যাগ দুঃখময়। এই কবি—বিধাতা যাঁর হাতে বাঁশী দিয়ে পাঠিয়েছিলেন—তিনি যখন অধ্যাপনার কাজে বদ্ধ হলেন তখন তা তাঁকে কোন সাহায্য করেনি। আমি তাঁর সেই বেদনা অনুভব করেছি। আজকের দিনে তাঁর স্মৃতি-সভায় আমি সেই বেদনার কথা নিয়ে এসেছি। যে পাখীকে বিধাতা বনে পাঠিয়েছিলেন তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের খাঁচায় বদ্ধ করা হয়েছিল, বিধাতার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে। আজ আমাদের সেই বেদনার অনুশোচনা করবার দিন। তাঁর কন্যা লতিকা যা বল্লেন সে কথা সত্য। তিনি নিভৃতে কাব্য রচনা করে গিয়েছেন, প্রকাশ করবার জন্যে কোন দিন ব্যগ্রতা অনুভব করেন নি, নিজকে সর্ব্বদাই প্রচ্ছন্ন রেখেছেন। একদিকে এটা খুব বড় কথা। এই যে নিজের ভিতরে নিজের সৃষ্টির আনন্দ উপলব্ধিতে নিমগ্ন থাকা, নিঃস্বার্থভাবে প্রতিপত্তির আকাঙ্ক্ষা দূরে রাখা, সৃষ্টিকে বিশুদ্ধ রাখা—এ খুবই বড় কথা। তিনি কর্ম্মকাণ্ডের ভিতরে যোগ দেননি। সংসারের রঙ্গভূমিতে তিনি দর্শক থাক্‌বেন, তাতে ঝাঁপিয়ে পড়বেন না এই ছিল তাঁর আদর্শ। কেননা, দূর থেকেই যথার্থ বিচার করা যায় ও ভাল করে বলা যায়। কর্ম্মের জালে জড়িত হ'লে তাঁর যে কাজ—বিশ্বরঙ্গভূমির অভিনয় দেখে আনন্দের গান গেয়ে যাওয়া—তাতে ব্যাঘাত হ'ত। যেমন কোন পাখী নীড় ত্যাগ করে যত ঊর্দ্ধে উঠে ততই তার কণ্ঠ থেকে সুরের ধারা উৎসারিত হ'তে থাকে, তেমনি কবি সংসার থেকে ঊর্দ্ধে যান ততই বিশুদ্ধ রস ভোগ করতে পারেন ও কাব্যের ভিতর দিয়ে তা' প্রকাশ করতে পারেন। মনোমোহন ছিলেন সেই শ্রেণীর কবি। তিনি কর্ম্মজাল থেকে নিজকে নির্ম্মুক্ত রেখে আপনার অন্তরের আনন্দালোকে একলা গান করেছিলেন। কিন্তু একথা আমি বলব যে যদি সাধারণতঃ সংসার রঙ্গভূমির সমস্ত কোলাহলে আবদ্ধ হওয়া কবির পক্ষে শ্রেয়ঃ নয়, তথাপি কাব্যের ভিতর দিয়ে সকলের সঙ্গে নিজের সংযোগ স্থাপন না হলে একটা অভাব থেকে যায়। যদিচ জনতার বাণী মহাকাল সব সময়ে সমর্থন করেন না, তাহলেও খ্যাতি-অখ্যাতির তরঙ্গ দোলায় দোলায়মান জনসাধারণের চিত্তসমুদ্র যে কবির বিহারক্ষেত্র একথা অস্বীকার করা যায় না। একান্ত নিভৃত যে কাব্য তাতে একটা সঙ্গহীনতার বেদনা আছে। মনোমোহন যে তাঁর কাব্য প্রকাশ করতে ব্যগ্র হননি তার কারণ এই যে, তিনি যে ভাষায় তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন, সেই ইংরাজী ভাষায় তাঁর এত সূক্ষ্ম অধিকার ছিল যে আমাদের দেশে আমরা যারা ইংরেজী ঘনিষ্ঠভাবে জানিনে, ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় নেই, আমাদের পক্ষে তাঁর কাব্যের সূক্ষ্ম উৎকর্ষ উপভোগ করা দুরূহ। তিনি

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

জানতেন যে এদেশে তাঁর সঙ্গ সম্পূর্ণভাবে জুটতে পারে না। যে কোন বিদেশী ভাষা খুব ভাল জানে না তার পক্ষে সেই ভাষার সাহিত্যের মধ্যে একটা অন্তরাল থেকে যায়। যেমন কঠিন জেনানা যাঁরা রক্ষা করেন তাঁদের পক্ষে অন্তঃপুরিকাদের নাড়ী দেখানো কঠিন হয়, পর্দ্দার আড়াল থেকে একজন নাড়ী দেখে ডাক্তারকে বলে দিতে হয়, আমাদের পক্ষে ইংরেজী সাহিত্যও তাই। অন্তঃপুরবাসিনী সাহিত্যলক্ষ্মী আমাদের কাছে সম্পূর্ণ দেখা দেন না, আমরা শুধু তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। মুখের ভঙ্গিমা—যাতে অর্থ সুস্পষ্ট বোঝা যায় সেগুলি আমরা দেখতে পাইনা। আমি যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান পাইনি তথাপি ইংরেজী সাহিত্য কিছু কিছু পড়েছি। আমি যখন শেলী ইত্যাদি পড়ি তখন কোন কোন জায়গায় রসটি ঠিক না বুঝলেও মনে করি মেনে নেওয়াই ভাল। এ ছাড়া গতি নেই, বিশেষতঃ যখন তা না করলে পাস করা অসম্ভব। ইংরেজীতে মনোমোহন ঘোষের অসাধারণ কৃতিত্ব ছিল। তিনি ইংলণ্ডে মানুষ হয়েছিলেন ও অক্সফোর্ডের গুণীদের সংসর্গ লাভ করেছিলেন। কাজেই সে দেশের ভাষার সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট পরিচয় ছিল। কিন্তু যে ভাষায় তিনি কাব্য রচনা করেছিলেন তার সম্পূর্ণ মিল এ দেশবাসীর পক্ষে অসম্ভব। এই বেদনা ছিল তাঁর জীবনে। তিনি কবি থেকে ইস্কুল মাষ্টার হয়েছিলেন। আবার অসামান্য অধিকার নিয়েও যে ভাষায় তিনি তাঁর বাঁশী বাজিয়েছিলেন সে ভাষার দেশ এদেশ নয়। তিনি বুঝেছিলেন কবির দিক থেকে তাঁর ঠিক সঙ্গ আমাদের দেশে পাওনা কঠিন। তিনি যদি চিরদিন ইংলণ্ডে থাকতেন তবে যে সব কবির সঙ্গ বাল্যে পেয়েছিলেন তাদের মধ্যে থেকে তিনি এত একলা হয়ে পড়তেন না। পরস্পরের সঙ্গে তাঁর রস বিনিময় হতে পারত। এই রস বিনিময়ের প্রয়োজন যে নাই, একথা কখনো স্বীকার করা যায় না। মানুষের সহিত মানুষের সঙ্গের ভিতর দিয়েই প্রাণশক্তির উদ্বোধন হয়। মানুষের চিত্ত অন্য চিত্তের অপেক্ষা রাখে। কেউ অহঙ্কার করে বলতে পারেন না, আমি কবি হিসাবে অন্যের অপেক্ষা রাখিনে। কিন্তু এই সঙ্গ না পেয়েও মনোমোহন ঘোষ হাল ছাড়েননি। আপনার ভিতরে সমাহিত হয়ে তিনি কাব্যের আরাধনা করে গেছেন। সে কাব্যের জয়কার হোক। চিত্তের সঙ্গে চিত্তের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করবার মধ্যে একটা গৌরব আছে। বিশ্বজগতের মানুষের সঙ্গে, একটা সত্যকার যোগ হবে, আমাদের অন্তরের মধ্যে সে ইচ্ছা কি নেই? যখন সে সঙ্গ না পাই তখন অভিমানে বলি, কাউকে আমার চাইনে। মানুষের সঙ্গে যোগস্থাপনের মানুষের সে স্বাভাবিক ইচ্ছা যখন ব্যর্থ হয় তখনই আমরা অভিমান করে বলি, আমি কারো সঙ্গ চাইনে।

কবি মনোমোহনের কাব্যের যখন প্রকাশ হবে তখন সমস্ত পাশ্চাত্য দেশের কাছে বাংলা দেশের আলোক কি উজ্জ্বল হবে না? তারা কি বলবে না, এঁদের সৃষ্টির আশ্চর্য্য শক্তি আছে? প্রকাশ মানেই হচ্ছে বিশ্বজগতের সর্ব্বত্র প্রকাশ। যে জ্যোতিষ্কের আলো আছে, তার কেবল এপারে প্রকাশ, ওপারে নয়, এতো হয় না। 'সাহিত্য' শব্দের ধাতুগত অর্থ আমি জানিনে। একবার আমি বলেছিলাম, 'সাহিত্য' অর্থাৎ সকলের সঙ্গে যে সঙ্গ লাভ। কালিদাস, বেদব্যাস প্রভৃতি সকল মহাকবি সমস্ত পৃথিবীর মানুষের কাছে ভারতের চিত্তজ্যোতিষ্ককে প্রকাশ করেছেন। সকলেই বলেছেন এ কবি আমাদেরও কবি। যে সমস্ত ঐশ্বর্য্য দ্বারা বিশ্ব ধনী হয়, সে সমস্ত ঐশ্বর্য্যদ্বারাই সমকক্ষতার যোগ স্থাপিত হয়। সাহিত্য মানে সমকক্ষতার যোগ। এই কবি মনোমোহন নিগূঢ় নিকেতন থেকে যা বের করেছেন তা আজো ঢাকা রয়েছে। এ যখন প্রকাশ পাবে তখন বাংলা দেশের একটি মহিমা সর্ব্বত্র প্রকাশিত হবে। আমরা যদিও একটু বঞ্চিত হয়েছি, কিন্তু তাতে তাঁর দোষ নেই। আর কবিতা কেবল ইংরেজও নয়, কেবল বাঙ্গালীও নয়—কবি সকল দেশেরই কবি। এই কবির কাব্য প্রকাশ হলে পর সকলেই আনন্দের সঙ্গে তাকে অভ্যর্থনা করবে। আজ তাঁর স্মৃতিতে আমি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। তাঁর কাব্যের সঙ্গে আমার কিছু পরিচয় ছিল ; তিনি প্রায়ই তাঁর কাব্য আমাকে শুনাতেন। আমি শুনে মুগ্ধ হতাম। তাঁর প্রত্যেক শব্দচয়নের মধ্যে একটা বিশেষ সৌন্দর্য ছিল—আশ্চর্য্য নৈপুণ্যের সহিত তিনি তাঁর কাব্যের রূপ দিয়েছিলেন। আমার আশা আছে এ সকল কাব্য হতে সকল দেশের লোক আনন্দ পাবে—কেবল "গৌড়জন" নহে—সমস্ত বিশ্বজন, "তাহে আনন্দ করিবে পান সুধা নিরবধি"।

প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব ছাত্র—
শ্রীসুখেন্দুরঞ্জন রায় কর্তৃক অনুলিখিত। ■

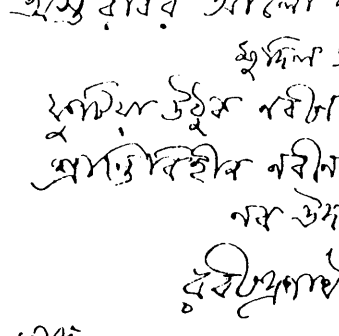

পরিশিষ্ট ৪

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073